Vol. 36 | No. 1 | 1992

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

‘কণিকা’-য় প্রবচন

Volume	36
Issue	1
Year	1992
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোঃ হারুন-আর-রশীদ
Published online	October 1, 1992
DOI	10.62328/sp.v36i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v36i1.8
Pages	165-195
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

‘কণিকা’-য় প্রবচন

মোঃ হারুন-আর-রশীদ

১.০ যুগযুগান্তরের অযুত মানুষের অমিত ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রবাদ- প্রবচন, জন-শ্রুতি পৃথিবীর প্রায় সব সাহিত্যেরই একটি বড় উপাদান। এ সবের নিপুণ প্রায়ুক্তিক বিন্যাস শক্তিধর মহৎ শিল্পীকে নান্দনিক মর্যাদায় অভিষিক্তই শুধু করেনা, পাঠক চিত্তকেও অভিভূত করে বিপুলভাবে। তাঁরা লাভ করেন ব্যাপক জনপ্রিয়তা। আবার কৃতী কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-নাট্যকারের প্রয়োগনৈপুণ্যেও সৃষ্টি হয় অনেক লোকাতীত কালোত্তীর্ণ সুভাষণ বা প্রমিত বচন-সমুচ্চয়, যা পরবর্তীতে প্রবাদ-প্রবচন ও জনশ্রুতির মতই কালের ‘কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল’[১] হয়ে থাকে। ব্যবহৃত হয় নানা প্রসঙ্গে বহুবিধ প্রয়োজনে। প্রসঙ্গত কতিপয় প্রবচনধর্মী প্রমিত বচন উল্লেখ্য:

১. Frailty, Thy name is women.[২]
২. বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।[৩]
৩. তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন।[৪]
৪. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে, তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।[৫]

লোক সাহিত্যের সাথে গুলিয়ে না ফেলে এগুলিকে আমরা অভিহিত করতে পারি সাহিত্যিক-প্রবচন হিসেবে।

১.১ উল্লিখিত প্রবচনসমূহ যেমন পৃথিবীর মানুষের অনন্ত কালের সোনার ফসল বলে বিবেচিত হবে, তেমনি এ-সব দৃষ্টান্ত দ্বারা নন্দিত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি-সাহিত্যিকদের প্রতিভার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করা যাবে। অর্থাৎ সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ বা সমাজতাত্ত্বিক উপযোগিতার কথা মনে রেখেও তাঁদের প্রাবচনিক মূল্যায়নের কথা ভাবনায় স্থান পেতে পারে। এবং এই সূত্রেই রবীন্দ্রকাব্যের প্রাবচনিক মূল্য বিষয়ে বর্তমান আলোচনার সূত্রপাত।

২.০ রবীন্দ্রপ্রতিভার বহুমুখীনতা এবং তাঁর কাব্য সাহিত্যের বিচার নানাভাবে নানাজনের হাতে প্রতিনিয়তই হয়ে আসছে এবং তা হওয়াই সঙ্গত। প্রবচন সৃষ্টিতে তাঁর পারঙ্গমতা এবং সার্থকতাও সম্ভবত কালাতীত বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। আলোচনার ১.০ চিহ্নিত অনুচ্ছেদের প্রথম উদ্ধৃতিটি নিয়েই শুরু করা যাক। শ্রুতিমধুর সুভাষণ হিসেবে তো বটেই 'কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' কথাটার অর্থদ্যোতকতাও কম ব্যঞ্জনামুখর নয়। মহৎ কোন আত্মত্যাগ, বিপুল কোন শোক, কিম্বা বেদনাঘন গভীরমূল কোন হৃদি অনুভব 'দু' বিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল' বাণীবদ্ধরূপে অজস্র ব্যবহারে ঋদ্ধ হতে পারে। অনুরূপভাবে *কড়ি ও কোমল* কাব্য গ্রন্থের 'প্রাণ' কবিতার 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে/ মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই/ জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই-'[৬] কথাটি জীবন-রসিক মানব-প্রেমী প্রতিটি মানুষের মর্ত্যপ্রীতির সুগভীর আকর্ষণই ব্যক্ত করে এবং সেই সঙ্গে কবির অনুভব সার্বজনীন প্রত্যাশায় উন্মুখর হবার সম্ভাবনায় উচ্চকিত হয়ে ওঠে।

২.১

সমাজ সংসার মিছে সব
মিছে এ জীবনের কলরব
শুধু আঁখি দিয়ে আঁখি সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।[৭]

সিক্ত হৃদয়ের জলাভূমিতে সৃষ্ট হৃদয়ার্তির অনুপম মর্মব্যঞ্জনা উদ্ধৃত অংশে মর্মরিত। এ গুঞ্জরিত আত্মার নির্মাল্য। কপোত-কূজনরত প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে এর চেয়ে বড় কাঙ্ক্ষিত প্রার্থনা অসম্ভব। বরং তাদের পক্ষে একথা বলাই সম্ভব যে, 'পঞ্চাশোর্ধে বনে যাবে এমন কথা শাস্ত্রে বলে/আমি বলি বানপ্রস্থ যৌবনেতেই ভাল চলে।'[৮] হৃদয় বৃত্তির ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত উক্তি দু'টি প্রবচন-মূল্যে উজ্জ্বল। যেমন উজ্জ্বল "মরণরে তুহু মম শ্যাম সমান"[৯]—জীবনের পরপারে অরূপলোকে মহাজীবনের সাথে নিরন্তর মিলানাকাঙ্ক্ষী মানুষের প্রাত্যহিক উচ্চারণে। অতএব রবীন্দ্র-সৃষ্ট বৈচিত্র্যমুখী প্রবচনগুলোর মূল্যায়নের কথা ভাবতে হয়।

২.২ বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে রবীন্দ্রকাব্যের প্রবচনসমূহ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিন্যস্ত হতে পারে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত বিভাজনের দাবী অযৌক্তিক। আমরা বরং বিষয়টি আরো খানিকটা খণ্ডিত ও বিষয়ীভূত করে নিয়ে *কণিকা* কাব্যের প্রাবচনিক মূল্য যাচাই করে দেখি। অবশ্য মূল আলোচনা শুরু করার আগে প্রবচনের সংজ্ঞা নির্ণয় জরুরি।

২.৩ প্রবচন হচ্ছে নীতিকথা-মূলক বা উপদেশমূলক সুবচন; যাতে স্পষ্টত হিতোপদেশ, প্রকৃষ্ট বচন বা প্রীতিময় কথাগুচ্ছের সাহায্যে শ্রোতাকে,

সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠককে মুগ্ধ করার চেষ্টা থাকে। প্রখ্যাত বাংলা অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় *শব্দকোষ*-এর দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় মুদ্রণ, ১৩৯০ ও ১৩৯২ পৃষ্ঠায় প্রবচন এবং প্রবাদ শব্দ দু'টির ব্যুৎপত্তিসহ অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে এভাবে:

প্রবচন ক্লী [প্র+ √বিচ্ + অন (ল্যুট) ভা]

১. প্রকৃষ্ট বচন, সদালাপ।
২. উপদেশ।
৩. ব্যাখ্যান।
৪. বেদার্থ যাহা দ্বারা উক্ত করা হয়।
৫. আগম, ধর্মগ্রন্থ।
৬. প্রকৃষ্টভাবে কথনীয়, অনুসন্ধানপূর্বক বাচ্য বা ব্যাখ্যেয়।

প্রবাদ পুং [প্র + √বিদ্ + অ + ঘঞ্) ভা]

১. পরস্পর কথোপকথন, সম্ভাষ।
২. লোকাপবাদ, লোকনিন্দা।
৩. পরস্পর আগত বাক্য, প্রসিদ্ধ লোকবাদ; কিংবদন্তী, জনশ্রুতি।[১০]

স্বল্প-পরিসর বর্তমান আলোচনায় প্রবাদ ও প্রবচনের সংজ্ঞা নির্ণয়ের বিস্তৃত অবকাশ নেই। আমরা শুধু এ বিষয়ে একটি রূপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা করছি। মোহাম্মদ হানিফ পাঠান সংকলিত *বাংলা প্রবাদ পরিচিতি* গ্রন্থ থেকে ডক্টর মুহম্মদ আব্দুল খালেক তাঁর *মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে লোক উপাদান* অভিসন্দর্ভে প্রবাদ বিষয়ে নিম্ন উদ্ধৃতিটি ব্যবহার করেছেন:

> প্রবাদগুলোতে সাধারণতঃ সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, বাস্তবতা, রসিকতা, ব্যঞ্জনাময়তা প্রভৃতি গুণ থাকে। প্রবাদের এই সমস্ত গুণাবলীর উপর নির্ভর করে সাধারণভাবে বলা যায় দৈনন্দিন ব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অন্তরের গভীরতম অনুভূতি থেকে সমুৎপন্ন সহজ সরল সংক্ষিপ্ত ব্যঞ্জনাময় প্রচলিত বাক্য বা বাক্য সমষ্টির নাম প্রবাদ।[১১]

ডক্টর খালেক প্রবাদ সম্পর্কে স্পেনদেশীয় একটি সক্ষিপ্ত সংজ্ঞার ইংরেজি অনুবাদ করেও তাঁর পূর্বোক্ত অভিসন্দর্ভে ব্যবহার করেছেন। সেটি হচ্ছে ' A proverb is a sentence bassed on Long Experience.'[১২] পাশ্চাত্য পণ্ডিত W.C. Hzlitt-এর ভাষায় এ বিষয়ে তিনি আরো বলেন, 'An expression or combination of Words conveying a Truth of the mind by a figure peripharasis, anti Thesis or hyperbole.'[১৩] অর্থাৎ যে চিরন্তন সত্য অলংকার, ছন্দ-মাধুর্য প্রভৃতির মাধ্যমে লোকমনে বিস্তার লাভ করেছে, তাই-ই প্রবাদ।—

বর্তমানে প্রবাদ বলতে আমরা যা বুঝি, একসময় বচন শব্দ দিয়েই তা বুঝানো হতো। প্রবাদের সংজ্ঞায় যে সংক্ষিপ্ততম অভিব্যক্তির কথা বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সময় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি পত্রে তা খণ্ডন করেছেন। তাঁর মতে প্রবাদ কথাটার মধ্যে একটা গল্পের ভাব জড়িয়ে আছে, কিন্তু বচন ছাঁটা কাটা কথা, হয় আনন্দ দেয়, না হয় দুঃখ দেয়, না হয় কিছু অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দেয়, যেমন খনার বচন, ডাকের বচন।[১৪]

সাম্প্রতিক কালে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা প্রবাদ ও প্রবচনকে সমার্থক শব্দ মনে করেন, যেমন ডক্টর মুহম্মদ আবদুল খালেকের মতে 'প্রবাদ শব্দের আভিধানিক অর্থ যাই হোক না কেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বচনের' যে আভিধানিক অর্থের কথা বলেছেন, বর্তমানে প্রবাদের অর্থ তা থেকে মোটেই ভিন্ন কিছু নয়;'[১৫] তবুও আমাদের সচেতন অনুধাবন 'বচন'-এর সাথে প্র উপসর্গ যুক্ত করেই আবর্তিত হবে; যদিও *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ দেয় শব্দ দু'টির ব্যুৎপত্তি ও অর্থ শেষোক্ত অভিমতের সাথে প্রায় অভিন্ন।

অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ করলেও দেখা যাবে প্রবাদ-প্রবচন, কিংবদন্তী, জনশ্রুতি প্রায় সমার্থক শব্দ। শব্দ-গুলোর ব্যবহারিক তাৎপর্য ও প্রচলিত অভিধা বেদভাষ্য, আগম-পুরাণ-ধর্মগ্রন্থের প্রায় সামমানিক। অন্তর্গত মূল্যায়নেও জ্ঞান-অভিজ্ঞতা, চরিত্র ও শিক্ষা-অর্জনের ক্ষেত্রে বেদ-পুরাণ-ধর্মগ্রন্থের অনুরূপ ভূমিকা প্রবাদ-প্রবচনের গুরুত্বকে প্রোজ্জ্বল করে তোলে এবং 'জীবন, সমাজ এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সত্য কথা বলে...It is called the wisdom of many and a wit of one'.[১৬] এ জন্যই ধর্মীয় বাণীর পবিত্র শিক্ষার মত এগুলিও কালাতীত শ্রদ্ধায় বরণীয়-অনুসরণীয়।

উপরে হানিফ পাঠান, স্পেনদেশীয় ও W.C Hzlitt-এর প্রদেয় প্রবাদের সংজ্ঞাত্রয়ের 'দৈনন্দিন ব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অন্তরের গভীর অনুভূতি থেকে সমুৎপন্ন', 'bassed on long Experience' এবং 'চিরন্তন সত্য, অলংকার, ছন্দমাধুর্য প্রভৃতির মাধ্যমে লোকমনে বিস্তার লাভ করে' কথাগুলোর উপর আমরা সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে চাই। চাই এ কারণে যে, নীতিকথা, তত্ত্বকথা বা হিতোপদেশমূলক প্রমিত বাণীসমুচ্চয়কে ডক্টর সুশীলকুমার দে-র মত অনেকেই প্রবাদ বলে স্বীকার করতে চান না।[১৭] অথচ দীর্ঘ ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা, দৈনন্দিন ব্যাপারে সংঘটিত ঘটনাসমূহ থেকে প্রাপ্ত বা অর্জিত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং চিরন্তন সত্যের ছন্দ-মাধুর্যময় কাব্যিক প্রকাশ, যা লোক মনে বিস্তার লাভ করে, ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং স্থান-কাল-পাত্র ও পরিপার্শ্ব উপযোগী হলে কথাচ্ছলে স্বতঃই যা লোকে ব্যাবহার করে তাই প্রবাদ বলে সংজ্ঞায়িত হয়েছে।

রবীন্দ্রসৃষ্ট প্রবচনগুলোর মধ্যেও উপর্যুক্ত প্রবাদ-বৈশিষ্ট্য অলক্ষণীয় নয়। বিশেষ করে *কণিকা* কাব্যের স্বল্প-পরিসর কবিতাগুলোর ক্ষেত্রে তো বটেই। *কণিকা*-র কবিতাগুলো দু'পংক্তি হতে দশ পংক্তির মধ্যে সীমিত। এ-গুলোর প্রধানতম গুণ মুহম্মদ হানিফ পাঠান কথিত 'সরলতা, সংক্ষিপ্ততা, বাস্তবতা, রসিকতা, ব্যঞ্জনাময়তা।'[১৮] 'দৈনন্দিন ব্যাপারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা অন্তরের গভীর অনুভূতি থেকে সমুৎপন্ন'[১৯]—কবি মনসিজ এ-গুলো। উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের ভাষায়:

> জগৎ ও জীবনকে গভীরভাবে দেখার ফলে রবীন্দ্র প্রতিভা কণিকায় এক অভিনব সাহিত্যরূপ সৃষ্টি করিয়াছে। জগতের প্রত্যেক বিষয় ও বস্তুকে অসাধারণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও সত্যকে কবি অতি অল্প কথায় অপূর্ব কবিত্বমণ্ডিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের তলদেশে গভীর জ্ঞান, নিপুণ শ্লেষ ও প্রচ্ছন্ন নীতির একটি ধারা প্রবাহিত হওয়ায় এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের এক মহামূল্য সম্পদে পরিণত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্রায়ত এক একটি কবিতার মধ্যে এক একটি ভাব চমৎকার উপমা, শ্লেষ ও আপাত বৈষম্যের সাহায্যে পাঠকের চিত্তে অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।[২০]

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যদিও কবিতাগুলিকে প্রবাদ বলে আখ্যায়িত করেননি, করেছেন 'এপিগ্রাম' বলে, তবুও পরিবেশিত প্রবাদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্যের আলোকে এগুলোকে প্রবাদ বলে অভিহিত করার ক্ষেত্রে তেমন কোন বিরাট অন্তরায় আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত এগুলোকে আমরা প্রবাদ-প্রবচন বলেই সনাক্ত করতে চাই।

৩.০ ইংরেজি 'এপিগ্রাম' বলতে যা বুঝায়, তা হচ্ছে 'সরল অথচ অর্থগৌরবে মূল্যবান'[২১] কবিতা। 'অতি অল্প কথায়, সমস্ত বাহুল্য বর্জন করিয়া সত্যের কবিত্বময় রূপ প্রদর্শন ও তাহার সহিত প্রচ্ছন্ন জ্ঞান ও শিক্ষার একটা ইঙ্গিত এই জাতীয় কবিতা'র [২২] চারিত্র। অর্থব্যাপ্তি ও প্রয়োগ-প্রসারের ফলে ধীরে ধীরে এপিগ্রাম-জাতীয় কবিতাগুলি কাব্যের অভিজাত এলাকায় স্থান লাভ করেছে। রূপবৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য বিচারে এপিগ্রামকে প্রবাদ-প্রবচনের সামমানিক মনে করা যায়। *কণিকা*-র ক্ষেত্রেও আমরা তাই বলতে চাই। অর্থাৎ জাতে এপিগ্রাম, পাতে প্রবাদ-প্রবচন-ধর্মী। তার অতীত উৎসমূল যাই হোক, বর্তমানে তার স্বভাব বৈশিষ্ট্য অনেকটাই প্রবচন জাতীয়। এ কারণেই বর্তমান প্রবন্ধে *কণিকা*-র প্রাবচনিক মূল্যের অনুসন্ধান করা হচ্ছে। ভাব, ধর্ম ও অন্তগর্ত তাৎপর্যে *কনিকা*-র ১১১টি কবিতাকে নিম্নরূপ শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়:

১ অনিকেত চেতনা:বিভ্রান্তির চোরাবালি
২ অযোগ্য ব্যক্তিত্ব: যোগ্যতমের সমালোচনা
৩ মহত্ত্বের বিনয়: ক্ষুদ্রের ঈর্ষা বনাম সৌন্দর্যের অহংকার
৪ কর্ম বিমুখতার অভিশাপ : আত্মোদ্বোধন
৫ শক্তির দ্বন্দ্ব : পারস্পরিক উপযোগিতা
৬ স্বধর্মে নিষ্ঠ: পরধর্মে অসহিষ্ণু
৭ প্রতিভার বিকাশ : লালনিক প্রয়োজন
৮ মনিবের পাতে ঝোল : খাবে চুক চুক
৯ প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা : অপ্রত্যক্ষ বিজয়
১০ নিন্দুকের দুরাশা : ঈর্ষার প্রার্থনা
১১ রাজার নীতি বনাম নীতির রাজা
১২ প্রশংসার তৈলমর্দন : স্বার্থের মাছ শিকার
১৩ ঘরের শত্রু: বিভীষণ
১৪ স্পষ্টতা বনাম মিষ্টতা
১৫ শ্রমের মহিমা: ভিক্ষার লজ্জা
১৬ ক্ষমা বনাম প্রতিশোধ
১৭ নশ্বর: অবিনশ্বর
১৮ জ্ঞানের যথার্থতা : এক পার্শ্বিক অভিজ্ঞতা
১৯ বাস্তবতার দৃষ্টান্ত : দৃষ্টান্তের বাস্তবতা
২০ আত্মীয়তার গরজ : গরজের আত্মীয়তা
২১ উদার-অনুদার : ছোটোবড়োর প্রভেদ
২২ কৃতজ্ঞতা : অকৃতজ্ঞতা
২৩ ভালো বনাম মন্দ
২৪ স্বাধীনতা : পরাধীনতা
২৫ প্রকৃত সত্য : আদি রহস্য

৩.১ এবারে শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে কবিতাগুলোর মূল্যায়নের দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। তার আগে বলে নেয়া ভাল যে, ভাবনার স্বাতন্ত্র্য ও দৃষ্টিপাতের ভিন্নতা জনিত কারণে শ্রেণীবিন্যাসের রকমফের হতে পারে। অতএব বর্তমান বিভাজন চূড়ান্ত নয়। আমাদের বিভাজন মূলত কবিতা-গুলোকে মূল্যায়নের সুবিধার জন্য।

১. অনিকেত চেতনা : বিভ্রান্তির চোরা বালি—এ ধারার কবিতার মধ্যে পড়বে 'যথার্থ আপন', 'দানরিক্ত', 'ফুল ও ফল' প্রভৃতি কবিতা। আপন

উৎসমূলকে অস্বীকার করে ঊর্ধ্বলোক-বিহারী কল্পনা করা যে উৎকেন্দ্রিকতার নামান্তর, 'যথার্থ আপন' কবিতায় তা প্রাঞ্জল ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। জন্ম পরিবেশের গভীরে প্রোথিত নিজ সত্তার শিকড় অগ্রাহ্য করে সম্ভ্রান্ত-বিত্তশালী-উচ্চবংশীয় অনাত্মীয়কে স্বজন ভাবা 'বোঁটা কাটা'[২৩] বৃক্ষের মতই সত্তাবিলোপী হঠকারী পদক্ষেপ। অনাত্মীয় তাতে বিন্দু মাত্র আত্মীয় হয়না, উপরন্তু উৎপাটিত হতে হয় সপরিবেশ সমূলে। আত্ম অবমাননার সে এক মর্মান্তিক লজ্জা! অতএব যে আহাম্মক ভাবে 'বোঁটা যদি কাটা পড়ে তখনি পলকে/উড়ে যাবে আপনার জ্যোতির্ময় লোকে,'[২৪] তার চেয়ে বড় কুষ্মাণ্ড[২৫] আর কে হতে পারে? চোখের জল ফেলে সে কেন উপলব্ধি করবেনা, 'বোঁটা যবে কাটা গেল বুঝিল সে খাঁটি/ সূর্য তার কেহ নয়, সবই তার মাটি।'[২৬]

আমরা যাকে আত্ম প্রতিষ্ঠা বলি বা আত্ম নির্মাণ বলি তার পেছনে থাকে কোন না কোন খ্যাত-অখ্যাত জনের নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ কিংবা কারুর না কারুর অনুপ্রেরণা। মায়ের স্নেহ, ভাই-এর ভালোবাসা, বোনের সেবা, স্ত্রীর প্রেম, পিতার আত্মোৎসর্গ কিম্বা বন্ধু-পরিজনের নির্মল পরার্থপরতার বিনিময়ে গড়ে ওঠে এক একটা জীবন। আসে সাফল্য, যশ, খ্যাতি, ধনমান, প্রভাব, প্রতিপত্তি। সাফল্যের স্বর্ণশিখরে পৌছে এসবকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে, সিঁড়ির শেষ অবতলে উপনীত হয়ে সিঁড়ির ধাপগুলোকে অগ্রাহ্য করা। সাহিত্যের ভাষায় একেই বলে কৃতঘ্নতা। *কণিকা-র* ' দান বিক্ত' কবিতাটি এই কৃতঘ্নতা বিষয়ে।

আকাশ-কোণে বর্ষা-শেষের জলহারা মেঘকে ভাসমান দেখে জলহারা সরোবর, 'কহে, ওটা লক্ষ্মীছাড়া, চালচুলা হীন।'[২৭]–

আমি দেখ চিরকাল থাকি জল ভরা,
সারবান, সুগম্ভীর, নাই নড়া চড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু, করোনা গরব
তোমার পূর্ণতা সে তো আমারি গৌরব।[২৮]

'ফুল ও ফল' কবিতাতেও বিকাশের পশ্চাতে অলক্ষ্য অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে স্ফুটমান ফলের অবস্থান ফুলের মর্মমূলে। সুতরাং ফুল আগে, না ফল, এ প্রশ্ন তোলার অর্থই হচ্ছে মুরগী আগে, না ডিম-এর মত কূট তর্কে জড়িয়ে পড়া। তাই যখন—

ফুল কহে, ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল
কত দূরে রয়েছিস বল্ মোরে বল্।
ফল কহে, মহাশয় কেন হাঁকাহাকি,
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি।[২৯]

২. অযোগ্য ব্যক্তিত্ব: যোগ্যতমের সমালোচনা বা বাস্তবতার দৃষ্টান্ত: দৃষ্টান্তের বাস্তবতা—এ পর্যায়ের কবিতাগুলো হচ্ছে 'শক্তির সীমা', 'পরের কর্ম বিচার', 'গদ্য ও পদ্য', শত্রুতার গৌরব', অস্ফুট ও পরিস্ফুট', 'হাতে কলমে', 'কৃতীর প্রসাদ', 'অসম্ভব ভালো' প্রভৃতি। ক্ষুদে ক্ষমতা সম্পন্ন অযোগ্যতম ব্যক্তিদেরকে অন্যের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, কাজের সফলতা-বিফলতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে হরহামেশাই নগ্ন ও অযথার্থ সমালোচনায় তৎপর হতে দেখা যায়। এ শ্রেণীর লোকেরা আবার নিজেদের অক্ষমতাকে নানা অজুহাতে অন্যের ঘাড়ে ন্যস্ত করে প্রকৃত সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টা করে। এদের প্রবণতাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষা।'[৩০] 'শক্তির সীমা' কবিতায় কাঁসার ঘটির রূপকে এরা চিত্রিত হয়েছে। সামান্য কাঁসার ঘটি, যার পরিধি ও গভীরতা, শক্তি এবং সামর্থ নিতান্তই কম, সে সমালোচনা করে তার চেয়ে কয়েক হাজার গুণ গভীর কূপের, বলে 'কূপ তুমি কেন খুড়া হলেনা সাগর?' [৩১]—

> তাহা হলে অসংকোচে মারিতাম ডুব
> জল খেয়ে লইতাম পেটভরে খুব।[৩২]

শক্তির সীমা তাই দেখিয়ে দিতে হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে। বিনয়ের সঙ্গে বলতে হয় কূপকে—

> তুমি যত নিতে পার সব যদি নাও
> তবু আমি টিকে রব দিয়ে থুয়ে তাও।[৩৩]

অন্যদিকে শুধু মাত্র যারা সমালোচনার জন্য সমালোচনা করে, গঠনমূলক ভাবনার যাদের নিতান্তই অভাব, আত্মসমালোচনা ও সৃজনী প্রতিভাহীন সেই সব অসচেতন ব্যক্তিরা 'পরের কর্ম বিচার'[৩৪] কবিতার উপজীব্য। নাক ও কানের পারস্পরিক সমালোচনার রূপকে বিষয়টি পরিস্ফুট—

> নাক বলে, কান কভু ঘ্রাণ নাহি করে
> রয়েছে কুণ্ডল দু'টো পরিবার তরে।
> কান বলে, কারো কথা নাহি শুনে নাক
> ঘুমোবার বেলা শুধু ছাড়ে হাকডাক।[৩৫]

দায়িত্বহীন এসব অযথা সমালোচনা পরিত্যাগ করে কর্তব্য পালনে নিমগ্ন হওয়াই প্রকৃত আত্মসচেতন ব্যক্তির উচিত, এমন ভাব প্রকাশ পেয়েছে 'গদ্য ও পদ্য'[৩৬] কবিতায়:

> শর কহে, আমি লঘু, গুরু তুমি গদা,
> তাই বুক ফুলাইয়া খাড়া আছ সদা।

করো তুমি মোর কাজ, তর্ক যাক চুকে
মাথা ভাঙা ছেড়ে দিয়ে বেঁধো গিয়ে বুকে।[৩৭]

নিজের অপূর্ণতা, অক্ষমতা, অযোগ্যতা, ব্যর্থতা ও শক্তিহীনতার কথা স্বীকার না করে অন্যের উপর দোষারোপ করার প্রবণতার প্রকৃষ্ট নজির 'শত্রুতা গৌরব'[৩৮] কবিতা। বিষয়টা 'হাঁটতে না জানলে উঠোন বাঁকা' প্রবাদের মত। সূর্যের আলো সহ্য করার ক্ষমতা নেই প্যাঁচার, সে থাকে তাই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে অথচ সে-কথা সে স্বীকার করতে চায়না, বলে 'জাননা আমার সাথে সূর্যের শত্রুতা।'[৩৯]

'শক্তির সীমা'র কাঁসার ঘটির মত 'অস্ফুট ও পরিস্ফুট'[৪০] কবিতার 'ঘটি জল'[৪১] বিদ্রূপ করে মহাপারাবারকে। বলে 'আমি স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল, তুমি অন্ধকার।'[৪২] এসব কোনটাই বাস্তবতার দৃষ্টান্ত নয় বা দৃষ্টান্তের বাস্তবতাও নয়। হাতে কলমে কিছু সৃষ্টি না করে অন্যের সমালোচনা ও বিদ্রূপ করে যারা তাদের সমুচিত জবাব হিসেবে উল্লেখ করা যায় বোলতা ও মধুকরের বাদানুবাদ :

বোলতা কহিল, এযে ক্ষুদ্র মৌচাক,
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক।
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো ক্ষুদ্র মৌচাক রচো দেখে যাই।[৪৩]

'কৃতীর প্রমাদ'[৪৪] কবিতাও অযথার্থ সমালোচনার যথোপযুক্ত জবাব।—

টিকি মুণ্ডে চড়ি উঠি কহে ডগা নাড়ি,
হাত-পা প্রত্যেক কাছে ভুল করে ভারি।
হাত-পা কহিল হাসি, হে অভ্রান্ত চুল
কাজ করি আমরা যে, তাই করি ভুল।[৪৫]

সামগ্রিক মূল্যায়নের পরিবর্তে একদেশদর্শী সমালোচনাকে আর যাই হোক নিরপেক্ষ বিচার বলা যাবেনা। বরং এসব সমালোচনায় সমালোচকদের ব্যক্তিক ওজস্বিতা ও মূল্যের চেয়ে ঢের ঢের বেশী বাগাড়ম্বরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'কানা-কড়ি'র রূপকে এ বিষয়ে কবি বলেন —

কানাকড়ি পিঠ তুলি কহে টাকাটিকে
তুমি ষোলো আনা মাত্র নহ পাঁচ সিকে।
টাকা কয়, আমি তাই মূল্য মোর যথা
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা।[৪৬]

৩. মহত্ত্বের বিনয়: ক্ষুদ্রের ঈর্ষা বনাম সৌন্দর্যের অহংকার—এ ধারার কবিতার মধ্যে পড়ে 'ভার', 'মিত্রতা', উচ্চের প্রয়োজন', 'অচেতন মাহাত্ম্য', 'প্রকার ভেদ', 'মূল' প্রভৃতি। জীবনের প্রকৃত মহিমা ও গৌরবসুষমা শারীরিক সৌন্দর্যের মধ্যে থাকেনা, থাকে দেহাতিরিক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের গভীরে। নিতান্ত কদাকার ব্যক্তিও ব্যক্তিত্ব, চারিত্র ও শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জীবন নির্মাণ করে তিলে তিলে তার ভার বৃদ্ধি করতে পারে। বৃদ্ধি করতে পারে ব্যক্তিক ওজস্বিতা এবং সেখানেই তার প্রকৃত গৌরব। পক্ষান্তরে নয়ন স্নিগ্ধকর কমনীয় কোন ব্যক্তি যদি জীবন ভর অশিক্ষিত, অসংস্কৃত ও অমার্জিতই থেকে যায়, তাহলে সে মাকাল ফলের দৃষ্টান্তে উপমিত হতেই পারে; টুনটুনি ও ময়ূরের পারস্পরিক বাদানুবাদের রূপকে রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বাঙ্ময় করে তুলেছেন 'ভার' কবিতায়। টুনটুনি ময়ূরকে আক্রমণ করেছে এই বলে যে, 'দেহ তব যত বড় পুচ্ছ তার বাড়া।'[৪৭] অথচ 'আমি দেখো লঘুভারে ফিরি দিন রাত/ তোমার পশ্চাতে পুচ্ছ বিষম উৎপাত।'[৪৮] এ প্রসঙ্গে ময়ূরের উত্তর গভীর তাৎপর্যবাহী:

ময়ূর কহিল, শোক করিওনা মিছে
জেনো ভাই ভার থাকে গৌরবের পিছে।[৪৯]

অনুরূপভাবে বিনয়ে নত হওয়ার মধ্যে ছোটোত্ব নেই, আছে মহত্ত্ব। আছে আত্মসচেতনতা। তাই কঞ্চির বেড়া যখন বলে 'ওগো পিতামহ/ বাঁশবন, নূয়ে কেন পড় অহরহ'?[৫০]

আমরা তোমারি বংশ ছোটো ছোটো ডাল
তবু মাথা উঁচু করে থাকি চিরকাল[৫১]

তখন বাধ্য হয়ে

বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটোতে বড়োতে
নত হই, ছোটো নাহি হই কোনো মতে।[৫২]

'উচ্চের প্রয়োজন'[৫৩] ও জাগতিক ভারসাম্য রক্ষার খাতিরেই অত্যাবশ্যক। পৃথিবীতে ছোটোবড়ো, ধনী-গরীব, শ্রমজীবী-শ্রমসেবী, সম্ভ্রান্ত-অসম্ভ্রান্ত, বিত্তবান-চিত্তবান, উদার-অনুদার, প্রেমিক-অপ্রেমিক, বিশ্বস্ত-অবিশ্বস্ত সকল শ্রেণীর মানুষেরই প্রয়োজন। প্রয়োজন নানা পেশার, নানা জাতির। এত বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। সম্ভব পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করা। 'উচ্চের প্রয়োজন'—এ ভাবের দ্যোতক।—

বিধাতার অবিচার, কেন উঁচু নিচু
সে কথা বুঝিতে আমি নাহি পারি কিছু।[৫৪]

এ অভিযোগের উত্তরে গিরিবরের সযৌক্তিক জবাব এরকম:

গিরি কহে, সব হলে সমভূমি পারা
নামিত কি ঝরনার সুমঙ্গল ধারা?[৫৫]

পরার্থে নিবেদিত সচেতন আত্মত্যাগী শক্তির নিঃশব্দ ত্যাগ 'অচেতন মাহাত্ম্য'[৫৬] কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। বিষয়টা বাঁশবনের মাথা নোয়ানোর মত নত হওয়া কিন্তু কিছুতেই তা ছোটো হওয়া নয়। কবির বর্ণনায় বিষয়টা এরকম—

হে জলদ, এত জল ধরে আছ বুকে
তবুও লঘু বেগে ধাও বাতাসের মুখে।
পোষণ করিছ শত ভীষণ বিজুলি
তবু স্নিগ্ধ নীল রূপে নেত্র যায় ভুলি।
এ অসাধ্য সাধিতেছ অতি অনায়াসে
কী করিয়া সে রহস্য কহি দাও দাসে।
গুরু গুরু গরজনে মেঘ কহে বাণী
আশ্চর্য কী আছে এতে আমি নাহি জানি।[৫৭]

লক্ষণীয় যে এই উত্তরে জলদের বিনয়ই প্রকাশিত, অহংকার নয়। মহৎ যাঁরা, মহান যাঁরা, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এরকমই বিনয়-স্নাত। তাঁরা 'ঘটি জলে'র মত অন্ধ অহমকিা ব্যক্ত করে নিজেকে ছোটো করে তোলেননা। তাঁরা নত হন কিন্তু ছোটো হননা কিছুতেই।

'প্রকার ভেদ'[৫৮] কবিতার ভাবমাধুর্যও আত্মত্যাগের মহিমায় নির্মল, স্বার্থপরতায় পঙ্কিল নয়। এ পৃথিবীতে কেউ বেঁচে থাকার মধ্যে জীবনের সাফল্য মনে করে, টিকে থাকাই তাদের বেঁচে থাকার মাপকাঠি, আবার কেউবা পরোপকারে আত্মবিসর্জনের মধ্যে জীবনের প্রকৃত মহিমা খুঁজে পায়। কেউ ভোগের মধ্যে খোঁজে জীবনের সার্থকতা, কেউ ত্যাগের মধ্যে খোঁজে আনন্দ। সার্থকতার এই রকম ফের 'প্রকার ভেদ'-এর মূল তাৎপর্য:

বাবলা শাখা বলে, আম্র শাখা ভাই,
উনানে পুড়িয়া তুমি কেন হও ছাই?[৫৯]

আম্র শাখা বলে

বাঁচিয়া সফল তুমি, ও গো চূতলতা
নিজেরে করিয়া ভস্ম মোর সফলতা।[৬০]

'মূল'[৬১] কবিতার মূলেও আছে আত্মত্যাগের গর্ব। অলক্ষে থেকে যে ক্ষুদ্র নীচকে বড় করে তোলে, সেই প্রকৃত গৌরবের অধিকারী, সেই মূল, সেই শিকড়।—

আগা বলে আমি বড়ো, তুমি ছোটো লোক।
গোড়া হেসে বলে, ভাই, ভালো তাই হোক।
তুমি উচ্চে আছ বলে গর্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব মোর।[৬২]

৪. কর্ম বিমুখতার অভিশাপ: আত্মোদ্বোধন—এ ধারার কবিতা মাত্র একটি, 'অকর্মার বিভ্রাট'[৬৩]। কর্মই জীবনের চালিকা শক্তি। জীবন মানেই কর্ম। কর্ম বিচ্যুত নিরবচ্ছিন্ন অবসর অনিবার্য দুর্ভোগের স্মারক। কর্মভীরু স্থবির আয়েশকামী মানুষদের কবি উপমিত করেছেন ফলাহীন হলের সাথে। ফলার উপর হলের প্রচণ্ড রাগ, অপরিমেয় আক্রোশ। যেদিন থেকে ফলাকে তার সাথে জুড়ে দেয়া হয়েছে, তার ধারণা, সেদিন থেকেই তার দুর্ভোগের শুরু। কবির ভাষায়:

যেদিন আমার সাথে তোরে দিল জুড়ি
সেই দিন হতে মোর মাথা খোঁড়া খুড়ি।
ফলা কহে, ভালো ভাই, আমি যাই খসে
দেখি তুমি কি আরামে থাক ঘরে বসে।
ফলাখানা টুটে গেল, হল খানা তাই,
খুশি হয়ে পড়ে থাকে কোন কর্ম নাই।[৬৪]

কিন্তু হলের আপাত সুখ দুঃখে রূপান্তরিত হতে দেরী লাগল না। কর্মহীন জঞ্জাল ঘরে ফেলে রেখে লাভ কি, ভাবল চাষা এবং যেইনা ভাবা অমনি সে সিদ্ধান্ত নিলে 'এরে আজ চালা করে ধরাইব আখা।'[৬৫] চাষার সিদ্ধান্তের কথা শুনে বোধোদয় হল হলের।—

হল বলে ওরে ফলা, আয় ভাই ধেয়ে
খাটুনি যে ভাল ছিল জ্বলুনির চেয়ে।[৬৬]

মানব জীবনের সাথে কর্মের সম্পর্ক হলের সাথে ফলার বন্ধনের মতই অনিবার্য। কর্মকে অস্বীকার করা জীবনকে অস্বীকার করারই শামিল। এ-সব কথা স্বল্প পরিসর 'অকর্মার বিভ্রাট'-এ কী সাবলীল ছন্দ মাধুর্যেইনা কবি পুষ্পিত করে তুলেছেন। এর শাশ্বত প্রাবচনিক মূল্য অস্বীকার করা যাবে কি করে?

৫. শক্তির দ্বন্দ্ব: পারস্পরিক উপযোগিতা—পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থই পারস্প-

রিক উপযোগিতায় একে অপরের উপর নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে কেউই স্বাবলম্বী নয়। নয় আপনাতে আপনি স্বয়ংসম্পূর্ণ পৃথিবীর কিছুই। এমন কি আশরাফুল মখলুকাত মানুষও। মানুষও প্রকৃতির অবিচ্ছিন্ন উপাদান এবং প্রকৃতির সাথে সম স্বার্থে অভিন্ন। সুতরাং কার শক্তি বেশী, কার কম, কার উপযোগিতা কতটুকু, এ নিয়ে প্রশ্ন তোলা বৃথা। আপাত দৃষ্টে একজনের হার, অন্য জনের জিত মনে হলেও বিশেষ দৃষ্টিতে উল্টোটাও প্রতিপন্ন হতে পারে। ছোটো-বড়ো সবার পারস্পরিক বিনিময় ও পূর্ণতা-অপূর্ণতার সামগ্রিক ফলাফলের উপর বিশ্ব প্রকৃতির ছন্দ ও ভারসাম্য নিহিত। এ বিষয় নিয়েই কবির প্রাবচনিক কবিতা 'হার-জিত।'—[৬৭]

ভিমরুল মৌমাছিতে হল রেষারেষি,
দু'জনার মহাতর্ক শক্তি কার বেশি।[৬৮]

এ বিষয়ে বনদেবীর নিরপেক্ষ রায় নিম্নরূপ:

কেন বাছা নত শির! একথা নিশ্চিত
বিষে তুমি হার মানো মধুতে যে জিত।[৬৯]

'নদীর প্রতি খাল'[৭০] কবিতার তাৎপর্যও পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টান্তে উজ্জ্বল। নদনদীর জল সিঞ্চন ব্যতীত খালের অস্তিত্বের মহিমা অর্থহীন হয়ে পড়ে। জলহীন শুষ্ক খালের কীইবা মূল্য থাকে! ফলে খালের 'মোর লাগি মাথা কোটা-কুটি/নদীগুলো আপনি গড়ায়ে আসে ছুটি।'[৭১]— এই মিথ্যা অহমিকার ভ্রান্তি নিরসন করতে মোক্ষম একটি শ্লোক সৃষ্টি করতে হয় কবিকে। বলতে হয় 'তোমারে জাগাতে জল আছে নদী নদ।'[৭২] একই ব্যাপার ঘটে 'উপলক্ষের'[৭৩] ক্ষেত্রেও। মহাকালের ভব সৃষ্টির অহমকিা খান খান করে ভেঙ্গে পড়ে ঘড়ির প্রত্যুত্তরে 'তাহলে আমিও স্রষ্টা তব।'[৭৪] সত্যিতো মহাকাল যদি ভব সৃষ্টির হোতা হয়, তবে যে ঘড়ি মহাকালের পল অনুপলের সূক্ষ্ম হিসাব বক্ষে ধারণ করে রাখে, সে কেন দাবী করবে না কালের স্রষ্টা হিসেবে?

৬. স্বধর্মে নিষ্ঠ: পর ধর্মে অসহিষ্ণু—পৃথিবীতে যাঁরা কেবল স্ব-মতকেই চরম ও পরম জ্ঞান করেন, নিজের জানার বাইরেও যে থাকতে পারে অপার কোন রহস্য, সত্য, তত্ত্ব, মত ও মতাদর্শ—একথা যাঁরা ভুলেও ভাবেন না, বা ভাবতে চাননা, পরমত অসহিষ্ণু সেই সব ব্যক্তিদের বিচারবোধকে বলা যায় 'কীটের বিচার।'[৭৫]—

আমি যেটা নাহি জানি সেটা জানি ছার
আগাগোড়া কেটে কুটে করি ছার খার।[৭৬]

৭. প্রতিভার বিকাশ: লালনিক প্রয়োজন—শ্যামল শস্য প্রাপ্তির আনন্দে আপ্লুত হতে চাইলে যেমন নিয়মিত পরিচর্যা, পর্যাপ্ত জল সিঞ্চন, প্রয়োজনীয় সার ও নিড়ানীর দরকার, প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্রেও তেমনি সবিশেষ আনুকূল্য অত্যাবশ্যক। বৈরী পরিবেশের হাজারো বাধা পদে পদে ডিঙাতে হলে প্রতিভাবানদের পক্ষেও পরিপূর্ণ ফুলে-ফসলে বিকশিত হওয়া কঠিন। এজন্যই 'যথা-কর্তব্য'[৭৭]-এ ছাতার ধিক্কারে 'মাথা কয়,/ বুঝিতাম মাথার মর্যাদা, বুঝিতাম তার গুণে পরিপূর্ণ ধরা/ মোর একমাত্র কাজ তারে রক্ষা করা।'[৭৮]

৮. মনিবের পাত্রে ঝোল: খাবে চুক চুক—অন্ধস্তাবক যারা, যারা অনুক্ষণ প্রভুর সন্তুষ্টি বিধান নিমিত্তে খয়ের খাঁ গিরি করে বেড়ায়, কথায় কথায় বলে, জ্বী হুজুর, আলবত সত্য কথা হুজুর, তারা অন্য কাউকে প্রভুর তোয়াজ করতে দেখলে স্বভাবতই ঈর্ষায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা যেন—

লেজ নড়ে, ছায়া তারি নড়িছে মুকুরে
কোন মতে সেটা সহ্য করে না কুকুরে।[৭৯]

অথবা গৃহভৃত্যকে মনিবের চাম দোলাতে দেখে যেমন 'কুকুর চটিয়া ভাবে, এ কোন পামর।'[৮০] পোষা কুকুরের মতই স্বভাব অন্ধস্তাবক, স্তুতি বেসাতি মানুষদের। তাদের একমাত্র প্রত্যাশা:

মনিবের পাতে ঝোল খাবে চুক চুক
বিশ্বে শুধু নড়িবেক তারি লেজটুক।[৮১]

৯. প্রত্যক্ষ প্রতিযোগিতা: অপ্রত্যক্ষ বিজয়—অধিকাংশ সময় প্রত্যক্ষ প্রমাণই বড় কথা নয়। প্রমাণাতীত অধিকারও অনেক সময় অধিকারের বাড়া হতে পারে। প্রত্যক্ষের জবরদস্তি নয়, অপ্রত্যক্ষের নিভৃত পদচারণা নাড়িয়ে দিতে পারে ভিত্তিমূল ধরে। যেমন স্ত্রী ও প্রেমিকার অধিকার। একজন সামাজিক আইনের গভীরে প্রতিষ্ঠিত, অন্যজন আত্মার নির্মাল্যে সতত পূজিত। এদের কার অধিকার বেশী? সমাজিক ও ধর্মীয় আইনে নিঃসন্দেহে স্ত্রীর অধিকারই বেশী কিন্তু হৃদয়ধর্মের বিচারে প্রেমিকার অধিকার সর্বৈব নয়, এ কথা বলা যায় কি? সুতরাং

মাটির গভীরে তার দখল প্রচুর
প্রত্যক্ষ প্রমাণে জিত হইল কচুর।[৮২]

—একথা বলার মধ্যে আপত্তিকতার প্রমাণ হলেও মনের উপর পলাশ বকুলের অধিকারহীনতা বুঝায় না। স্থূল বিষয়বৃদ্ধিতে দড় মানুষের কাছে কচুর উপযোগিতা বেশী হলেও রসবোধের বিচারে বনের উপর পলাশ বকুলেরই প্রাধান্য। প্রথমটি স্থূল ভোগের উপাদান, দ্বিতীয়টি সূক্ষ্ম উপ-ভোগের। ভোগের চেয়ে উপভোগ বড়, যেমন পদের চেয়ে পদবী।

১০. নিন্দুকের দুরাশা: ঈর্ষার প্রার্থনা—এই উপ-বিভাগটিকে 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস : আত্মতুষ্টির অভাব'-এই শিরোনামেও অভিহিত করা যায়। পৃথিবীতে আপন অবস্থা ও অবস্থানে প্রায় কেউই সন্তুষ্ট নয়। সকলেই ভাবে তার চেয়ে অন্যজনই অধিকতর ভাল অবস্থা ও অবস্থানে আছে। মানুষের এই মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা করেছেন 'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস/ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস'[৮৩]—বলে। এবং এই আত্মতুষ্টির অভাবজনিত কারণে প্রায় সকলেই অবস্থানের বদল ঘটিয়ে অবস্থার উন্নতি কামনা করে। মানুষের অবস্থা আসলে মালাকরের ছুঁচ-এর মত। ছুঁচ হয়ে না ফুটে সে চায় জুঁই হয়ে ফুটতে। মালাকরের বাগানে জুঁই হয়ে ফোটা মানেই যে ছুঁচের অজস্র আঘাতে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে তোলা—একথা ছুচঁ বেচারার একবারও মনে পড়ে না। জুঁই কিন্তু ফুল হয়ে ফোটার যন্ত্রণা ঠিকই জানে। সে কারণেই—

> জুঁই কহে নিশ্বসিয়া, আহা হোক তাঁই
> তোমারও পুরুক বাঞ্ছা আমি রক্ষা পাই।[৮৪]

' প্রবীণ ও নবীন'[৮৫] কবিতার তাৎপর্যও একই রকম:

> পাকা চুল মোর চেয়ে এত মান্য পায়
> কাঁচা চুল সেই দুঃখে করে হায়-হায়।[৮৬]
>
> পাকা চুল বলে, মান সব লও বাছা,
> আমারে কেবল তুমি করে দাও কাঁচা।[৮৭]

আম ও ইক্ষুর নিজ নিজ মনোবাঞ্ছাও আত্ম-অসন্তুষ্টি থেকেই জাত। দু'জনেই অবস্থানের বদল ঘটিয়ে অন্যের স্থান অধিকার করতে চায়। কবির বর্ণনায়—

> আম্র, তোর কী হইতে ইচ্ছা যায় বল্।
> সে কহে, হইতে ইক্ষু সুমিষ্ট সরল।—
> ইক্ষু, তোর কী হইতে মনে আছে সাধ?
> সে কহে, হইতে আম্র সুগন্ধ-সুস্বাদ।[৮৮]

১১. রাজনীতি বনাম নীতির রাজা—রাজনীতির ক্ষেত্রে ন্যায়নীতি, সততা,

সত্যপ্রিয়তা, বিশ্বস্ততা, ওয়াদা ইত্যাদি শব্দের আভিধানিক কোন মূল্য নেই। স্থান কাল পাত্র ভেদে রাজনৈতিক প্রয়োগ এসব শব্দের ভিন্ন অর্থদ্যোতনা করে। সূচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হবার প্রয়োজনে মুখে মধু বুকে বিষ লুকিয়ে রাখতে হয়। ছলে বলে কলে কৌশলে কার্যসিদ্ধির নাম রাজনীতি। নীতির রাজা নয়, রাজার নীতিই রাজনীতির বর্তমান অভিপ্রেত ব্যঞ্জনা। তাই রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতারণা প্রতারণা নয়, কৌশল। ছলনা কূটনৈতিক চাল। ফলে স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কৌশলগত যে কোন চাতুরী এসব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত *কণিকা*-র 'রাষ্ট্রনীতি'[৮৯] কবিতাটি।—

> কুড়াল কহিল, ভিক্ষা মাগি, ওগো শাল,
> হাতল নাহিকো, দাও একখানি ডাল।

ডাল নিয়ে হাতল প্রস্তুত হল যেই—

> একেবারে গোড়া ঘেঁষে লাগাইল কোপ,
> শাল বেচারার হল আদি অন্ত লোপ।[৯০]

এই পর্যায়ের আর একটি কবিতা 'চুরি-নিবারণ'[৯১] কবিতাটিতেও স্বার্থ উদ্ধারের এক অভিনব ও নির্লজ্জ কৌশলের বর্ণনা পাওয়া যায়। সপত্নীবিদ্বেষী সুয়োরানী রাজাকে বুঝায়, দুয়োরানীটার গোয়াল ঘরের কোণে বাসা বাধার কারণ কি জানেন মহারাজ? কারণ হচ্ছে 'কালো গোরুটিরে তব দুয়ে নিতে চায়।[৯২]

> রাজা বলে, ঠিক ঠিক, বিষম চাতুরী—
> এখন কী করে ওর ঠেকাইব চুরি।
> সুয়ো বলে, একমাত্র রয়েছে ওষুধ,
> গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ।[৯৩]

কালে কালান্তরে ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের নির্লজ্জ দৃষ্টান্তের প্রকৃষ্ট নজির হিসেবে আলোচ্য কবিতাটির শেষ লাইন বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রবচনের মত ব্যবহৃত হতে পারে। অনুন্নত দেশের ক্ষমতাসীন সরকার থেকে আদর্শহীন রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরকে দোষারোপ করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা সুয়োরানীর 'গোরুটা আমারে দাও, আমি খাই দুধ'[৯৪] এর মত নয় কি?

১২. প্রশংসার তৈল মর্দন: স্বার্থের মাছ শিকার —অন্যের মুখে নিজের প্রশংসা শুনতে কে না ভালোবাসে? প্রশংসার উৎকোচে তুষ্ট হয় না কে? 'গুণজ্ঞ'-তে আছে যার রসময় চমৎকার বর্ণনা। নয়ন স্নিগ্ধকর বর্ণিল পাখায়

প্রজাপতি ঘুরে বেড়ায় দিনভর। সবুজে-শ্যামলে তার সতত অভিসার অথচ কাব্যে তার স্থান নগণ্য। ভ্রমরকে তাই তার জিজ্ঞাসা 'কোন গুণে কাব্যে তুমি হয়েছে অমর'।[৯৬]—

অলি কহে, আপনি সুন্দর তুমি বটে,
সুন্দরের গুণ তব মুখে নাহি রটে।
আমি ভাই মধু খেয়ে গুণ গেয়ে ঘুরি
কবি আর ফুলের হৃদয় করি চুরি।[৯৭]

১৩. ঘরের শত্রু: বিভীষণ—আত্ম শত্রুতা, গৃহ-বিবাদ, ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্ব, আত্মীয়ে-আত্মীয়ে হানাহানি ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল যে ঘরের শত্রু বিভীষণের মতই ভয়ঙ্কর ক্ষতিকর, খোঁপা আর এলো-চুলের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের রূপকে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'আত্ম শত্রুতা'[৯৮] কবিতায় এবং এ বিষয়ে কবি একটি যৌক্তিক মতামতও ব্যক্ত করেছেন:

খোঁপা গেলে চুল যায়, চুলে যদি টাক—
খোঁপা, তবে কোথা রবে তব জয় ঢাক।[৯৯]

১৪. স্পষ্টতা বনাম মিষ্টতা—স্পষ্ট কথা হলেই যে সেটা সত্য কথা হবে, এমন কথা নেই। স্পষ্টতার মধ্যে মিষ্টতা নাও থাকতে পারে। সত্য ও মিষ্টতাহীন স্পষ্ট কথা কর্কশতা ও কটুতারই নামান্তর। ভরা বসন্তের ফুলবনে কোকিলকে কুহুতানে মত্ত হতে দেখে স্পষ্টভাষী 'কাক বলে, অন্য কাজ নাহি পেলে খুঁজি/বসন্তের চাটুগান শুরু হল বুঝি!'[১০০] উত্তরে কোকিল বলে—

স্পষ্ট ভাষা তব কণ্ঠে থাক বারো মাস,
মোর থাক মিষ্টভাষা আর সত্য ভাষ।[১০১]

১৫. শ্রমের মহিমা : ভিক্ষার লজ্জা—বিনা শ্রম লব্ধ জীবিকা ভিক্ষা-সামগ্রীর মত লজ্জাকর। তাতে পেট বাঁচলেও মন বাঁচেনা। ব্যক্তি টিকলেও ব্যক্তিত্বের অপমৃত্যু ঘটে। তাতে দাতা-গ্রহীতার পারস্পরিক গ্রহণ-বর্জন থাকলেও যাকে বলে অর্জনের মহিমা, গ্রহীতার বেলায় তা একেবারেই থাকেনা। নিতান্ত আত্মসম্মানহীন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল উঞ্ছবৃত্তিক জীবিকা গ্রহণ সম্ভব। ব্যক্তিত্বশালী উপার্জনকামী কোন মানুষের পক্ষেই একথা কাম্য নয় যে,

দিতে যদি হয় দে মা, প্রসন্ন সহাস
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস।
বিনা চাষে শস্য দিলে কী তাহাতে ক্ষতি?[১০২]

ক্ষতি এখানে যে পৌরষত্ব তাতে লাঞ্ছিত হয়, ত্রাস পায় অর্জনের শক্তি। ঘটে আত্মবিশ্বাসের অপমৃত্যু। এজন্যই—

শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী
আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে,
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।[১০৩]

১৬. ক্ষমা বনাম প্রতিশোধ—উদার শক্তি ধরিত্রী মাতা ধৈর্যশীল ও সর্বংসহা না হলে পৃথিবীতে ঘটত নানান অনর্থপাত। বিলুপ্ত হত প্রাণিকুল। বিষয়টি 'শক্তের ক্ষমা'-য় বিশ্লেষিত। পৃথিবীতে বাস করে পৃথিবীর নিন্দা করে যারা, যারা বলে মাটি, জল, বলে এ কেবল ধুলি জড়স্থল, নারদের পরামর্শ পৃথিবীকে তাদের জব্দ করার জন্য—

বন্ধ করো অন্ন জল, মুখ হোক চুন
ধূলামাটি কি জিনিস বাছারা বুঝুন।
ধরণী কহিলা হাসি, বালাই বালাই!
ওরা কি আমার তুল্য, শোধ লব তাই?
ওদের নিন্দায় মোর লাগিবে না দাগ,
ওরা যে মরিবে যদি আমি করি রাগ।[১০৪]

১৭. নশ্বর: অবিনশ্বর—বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তন, বাসনার রূপান্তর ও মনোভঙ্গির যে পরিবর্তন ঘটে এবং বস্তুগত নশ্বরতা-অবিনশ্বরতা বিষয়ে যে চেতনার সৃষ্টি হয় তার রসগ্রাহী বর্ণনা আছে *কণিকা*-র 'খেলেনা' কবিতায়।—

ভাবে শিশু বড় হলে শুধু যাবে কেনা
বাজার উজাড় করি সমস্ত খেলেনা।[১০৫]

কিন্তু যেইনা সে বড় হয়ে উঠল, চাহিদা গেল পালটে। তার কাছে সমস্ত খেলা এখন ঢেলা বলে মনে হয়। সে এখন শুধু 'দুই হাত তুলে চায় ধনজন-পানে।'[১০৬] কবির তাই সরস মন্তব্য—

আরো বড়ো হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার খেলার হাট হেসে যাবে ফেলে?[১০৭]

১৮. জ্ঞানের যথার্থতা : এক পার্শ্বিক অভিজ্ঞতা—এক পার্শ্বিক অভিজ্ঞতা জ্ঞানের যথার্থতা প্রমাণ করেনা। বরং অযথার্থ অভিজ্ঞতা ও একদেশদর্শী জ্ঞানের ফলে অন্তর্নিহিত ভাব-সত্যের প্রতি অবিচার করার সম্ভাবনা থাকে সমূহ। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন 'এক-তরফা হিসাব।'[১০৮] ক্রমবর্ধমান

চাহিদা পূরণ যে সবসময় বাঞ্ছনীয় নয়, তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লিখিত কবিতাটির মূল্যমান যথেষ্ট। টাকার থলির বেলায় সাতাশ একশো সাতাশ হলে দারুণ মজার হয় বটে, থলের পেট ভরে, থলেওয়ালার হাড়েও বাতাস লাগে কিন্তু সেটা বয়সের বেলায় হলে কেমন হয়?

অন্যদিকে অল্পবিদ্যার অসারতা বুঝাতে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন আর একটি মনোজ্ঞ কবিতা 'অল্প জানা ও বেশি জানা।"[১০৯] একদা এক সরোবরে এক তৃষ্ণার্ত গাধা গেল জল খেতে। কিন্তু জল কালো বলে তার আর খাওয়া হল না। 'ছি ছি কালো জল! বলি চলি এল ফিরে।'[১১০]—

কহে জল, জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল সাদা।[১১১]

২০. আত্মীয়তার গরজ : গরজের আত্মীয়তা—অবস্থাশালী বিত্তবান লোককে অনেকেই আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসে। আপন স্বার্থ ও গরজেই এসব আত্মীয়তার দোহাই তোলে মানুষ। ভাবে, এতে করে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে এবং ঐতিহ্যগত সামাজিক অবস্থান সুদৃঢ় হবে। এ বিষয়ে *কণিকা*-য় অন্তত দুটি কবিতা আছে, যথা 'গরজের আত্মীয়তা'[১১২] এবং 'সাম্যনীতি।'[১১৩]—

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে,
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কি রে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।[১১৪]

কহিল ভিক্ষার ঝুলি, হে টাকার তোড়া,
তোমাতে আমাতে ভাই, ভেদ অতি থোড়া-
আদান প্রদান হোক। তোড়া কহে রাগে,
সে থোড়া প্রভেদটুকু ঘুচে যাক আগে।[১১৫]

লক্ষণীয় যে পরিবেশিত উপর্যুক্ত কবিতা দুটির মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভাবও বিদ্যমান এবং তা হচ্ছে বিত্তহীন ব্যক্তি যেমন বিত্তশালী ব্যক্তিকে আত্মীয় করতে চায়, বিত্তশালী ব্যক্তিও তেমনি বিত্তহীনকে অনাত্মীয় ঘোষণা করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। একটি দৃষ্টান্ত—

কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে
ভাই বলে ডাক যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা
কেরোসিন বলি উঠে এসো মোর দাদা।[১১৬]

প্রবাদে একেই বলে 'তেলে মাথায় তেল দেয়া।' বিত্তের বন্ধু রিক্তের অনাত্মীয়; 'থলি বলে কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে/আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে'[১১৭] এবং 'তোড়া কহে রাগে,/সে থোড়া প্রভেদটুক ঘুচে যাক আগে'[১১৮] প্রভৃতি পংক্তির মধ্যে এ ভাব সূর্যালোকের মত উজ্জ্বল।

২১. উদার-অনুদার : ছোটো-বড়োর প্রভেদ—ঔদার্যের মধ্যে মহত্ত্বের পরিচয়। মহৎ-হৃদয় উদার মানুষেরা সব সময় ক্ষুদ্র ও হীনজনদের সাথে সখ্যের সঙ্গে কুশলাদি বিনিময় করে থাকে। এটা তাদের চিত্তগত মহত্ত্বেরই নির্দশন। পক্ষান্তরে ছোট যারা, মাঝারি যারা, তারা প্রায়শই অহংগর্বী হয়। হরহামেশাই তারা ব্যক্ত করে হীনজনদের প্রতি অপরিমেয় অবজ্ঞা ও অনাত্মীয়তা-সূচক মনোভাব। 'উদারচরিতানাম্'[১১৯] ও 'মাঝারির সতর্কতা'[১২০] শীর্ষক কবিতাদ্বয় এ বিষয়ের প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।—

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নাম গোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই?[১২১]

সূর্য যেহেতু মহতের প্রতীক, সেহেতু তার কল্যাণী করস্পর্শ সর্বব্যাপী। 'মাঝারির সতর্কতা'-য় বিষয়টি আরো স্পষ্ট ও বিষয়ীভূত হয়ে উঠেছে।—

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।[১২২]

২২. কৃতজ্ঞতা : অকৃতজ্ঞতা—আমরা যাকে বলি 'ছোটো মুখে বড়ো কথা', ক্ষুদ্র সীমিত শক্তির দম্ভোক্তি, 'স্পর্ধা-য়[১২৩] তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে অভিব্যক্ত:

হাউই কহিল, মোর কী সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই!
কবি কহে, তার গায়ে লাগে নাকো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।[১২৪]

'অযোগ্যের উপহাস'[১২৫] ও 'ক্ষুদ্রের দম্ভ'[১২৬] কবিতাদ্বয়েও, অনুরূপ সীমাতিরিক্ত অহংকার ব্যক্ত হয়েছে।—

নক্ষত্র খসিল দেখি দীপ মরে হেসে।
বলে, এত ধুমধাম, এই হল শেষে!
রাত্রি বলে, হেসে নাও, বলে নাও সুখে
যতক্ষণ তেলটুকু নাহি যায় চুকে।[১২৭]

শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির,
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।[১২৮]

আত্মঅহংকারে লিপ্ত হতে দেখলেই সন্দেহ করার কারণ ঘটে যে, অহংকার যথার্থ কিনা, সত্য কিনা তার আসলত্ব। এ ভাব ব্যক্ত হয়েছে 'সন্দেহের কারণ'[১২৯] কবিতায়—

কত বড়ো আমি, কহে নকল হীরাটি।—
তাইতো সন্দেহ করি নহ ঠিক খাঁটি।[১৩০]

নিজেকে বড়ো করে তুলবার শক্তি যার সীমিত, সে কি পারে বড়োকে ছোটো করে তুলতে?—

শক্তি যার নাই নিজে বড়ো হইবারে
বড়োকে করিতে ছোটো তাই সে কি পারে?[১৩১]

—পারেনা এবং পারে না বলেই তার অকৃতজ্ঞতা ও দম্ভোক্তি যায় সীমাকে ছাড়িয়ে। ধ্বনির পিছে যেমন ছোটে প্রতিধ্বনি:

ধনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।[১৩২]

২৩. ভালো বনাম মন্দ—অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর অস্তিত্ব অকল্পনীয়, মিথ্যা না থাকলেও তেমনি সত্যের অস্তিত্ব অসম্ভব। অনুরূপভাবে মন্দ না থাকলে ভালো পাব কোথায়? জাল যদি সত্যি প্রতিজ্ঞা করে বসে 'পঙ্ক আমি উঠাবনা আর'[১৩৩] তা হলে জলের পক্ষে না-বলে উপায় থাকবে না যে, 'মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।'[১৩৪] অর্থাৎ ভালোমন্দ, সত্য-অসত্য, আলো-অন্ধকার একে অপরের পরিপূরক। একই পথের পথিক এরা—সহযাত্রী একে অপরের। ভুলের পথ মাড়িয়েই ঘটে সত্যের অভ্যুদয়। এ কারণেই সর্বতোভাবে ভুলের দ্বার রুদ্ধ করে দিলে সত্যের অনুপ্রবেশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। কবি ঠিকই বলেন—

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি।[১৩৫]

অনুরূপভাবে কলঙ্কহীন চাঁদ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ব্যর্থতাহীন সাফল্য ও ত্রুটিহীন পরোপকার প্রায়শই দুর্নিরীক্ষ্য। পরোপকারীর ব্যক্তিক ত্রুটি ও কলঙ্ক একান্তভাবেই ব্যক্তিক। তার যা সাফল্য তার সবটাই সম'জ-সংসারের জন্য; ত্রুটি-বিচ্যুতি-কলঙ্ক-লাঞ্ছন তার নিজের। চন্দ্রের উপমায় এই মহৎ শিক্ষাটি প্রকাশ পেয়েছে 'নিজের ও সাধারণের'[১৩৬] কবিতায়।—

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।[১৩৭]

২৪. স্বাধীনতা: পরাধীনতা—যথেচ্ছাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার নাম যে প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, তার পরিচয় আছে 'স্বাধীনতা'[১৩৮] কবিতায়। ধনুক বিচ্ছিন্ন শর তীব্র বেগে ধাবিত হতে পেরে ভাবে, তার এই অবাধ ছুটে চলার ক্ষমতাই স্বাধীনতা। ভাবে 'ধনুকটা এক ঠাঁই বদ্ধ চিরদিন।'[১৩৯] ফলে—

ধনু হেসে বলে, শর, জান না সে কথা—
আমারি অধীনে জেনো তব স্বাধীনতা।[১৪০]

শরের স্বাধীনতার মূলে যেমন ধনুর অবদান অনস্বীকার্য, মানুষের স্বাধীনতার মূলেও তেমনি দেশ-সমাজ-পরিবেশ ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সুকঠোর শর্ত বিদ্যমান। আত্ম-নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। সমাজ পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত স্বাধীনতাও তেমনি উচ্ছৃঙ্খলতার শামিল। রাষ্ট্রের বেলায়ও একই কথা। রাষ্ট্রীয়ভাবে জনগোষ্ঠীকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল আচরণে পরিচালিত করতে ব্যর্থ হলে ভৌগোলিক স্বাধীনতা উৎকট স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

মানুষের প্রকৃত চালক হওয়া উচিত তার নিজের বিবেক, মনুষ্যত্ব ও কল্যাণকর শুভ্র চেতনা। সশাসিত ব্যক্তির সমন্বয়েই গড়ে ওঠে সুশাসিত সমাজ। 'সম্মুখে ঠেলিছে মোর পশ্চাতের আমি'[১৪১]—এই অনুভব একাধারে চেতনাময়-অতীত ও জাগ্রত বিবেক দুই হতে পারে। সম্ভবত কবি একেই অভিহিত করেছেন 'চালক' বলে[১৪২]। প্রকৃত চালক বিবেক ও মনুষ্যত্ব। অলক্ষ্যে থেকে সেই তো চালায় মানুষকে। বিবেক যেখানে ভোঁতা,মনুষ্যত্ব সেখানে ম্লান। মনুষ্যত্ব যেখানে ম্লান, উদ্যত পশুত্বের সেখানে জাগর বিচরণ। অতীত যেখানে কথা কয়, দেখিয়ে দেয় ভুল, সেখানেই নির্ভুল বর্তমানের গর্ভে জন্ম নেয় সুস্থ সবল নির্মল ভবিষ্যৎ।

২৫. প্রকৃত সত্য : আদি রহস্য—ইতিহাসেরও যেমন থাকে ইতিহাস, আরম্ভেরও আরম্ভ তেমনি আপাত উৎসমূলেও থাকে আর একটি উৎস—যা সামগ্রিক ও অখণ্ড দৃষ্টিপাত ছাড়া প্রায়শই অনুধাবন করা যায়না, 'আদি রহস্য'[১৪৩] কবিতায় তা অসম্ভব কৃৎকৌশলে তুলে ধরেছেন কবি। এই পর্যায়ের অন্যান্য কবিতা হচ্ছে 'ভক্তিভাজন'[১৪৪] 'অদৃশ্য কারণ'[১৪৫], 'সত্যের সংযম[১৪৬], 'সৌন্দর্যের সংযম',[১৪৭] 'বিরাম'[১৪৮] 'জীবন'[১৪৯] 'অপহরণীয়'[১৫০] 'সুখ-দুঃখ'[১৫১] 'সত্যের আবিষ্কার'[১৫২] 'ছলনা'[১৫৩] 'আরম্ভ ও শেষ'[১৫৪] ইত্যাদি।—

বাঁশি বলে মোর কিছু নাহিকো গৌরব
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব।
ফুঁ কহিল, আমি ফাঁকি, শুধু হাওয়াখানি—
যে জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি।[১৫৫]

'ভক্তি ভাজনে'ও আপাত ভক্তি ভাজনদের স্থূল বিভ্রান্তির অন্তরালে আদি রহস্যের ইঙ্গিত বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। প্রকৃত ভক্তিভাজন কে? পথ, না রথ? না রথারূঢ় দেবমূর্তি, তা নিয়ে স্বল্প পরিসর চার লাইনের কবিতায় কবি যে ভাবনার বিস্তার ও পরিসমাপ্তিতে চমক সৃষ্টি করেছেন, তা শুধু বিস্ময়করই নয়, শক্তিধর প্রবচনকার-ব্যক্তিত্বেরও পরিচয়বহ:

রথ যাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুম ধাম,
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে আমি দেব, রথ ভাবে আমি,
মূর্তিভাবে আমি দেব—হাসে অন্তর্যামী।[১৫৬]

'সৌন্দর্যের সংযম' আর এক রহস্যের আকর। হাজারো বন্ধনের সৌম্যই নারীকে সুন্দর করে তুলেছে। তার সৌন্দর্যের রহস্য সংযমের তুলিকা স্পর্শে জীবন্ত। বেশভূষায় বাধা, চলনে-বলনে বন্ধন এবং জীবনাচারের হাজারো প্রতিবন্ধকতা পদে পদে ডিঙ্গিয়ে যেতে হয় বলেই নারী হয়ে উঠেছে সুন্দর-শোভন:

পদে পদে বাধা তব কহে তারে নর।
কবি কহে, তাই নারী হয়েছে সুন্দর।[১৫৭]

স্বার্থতাগ করতে পারলে অনুরাগ ও বৈরাগ্য একার্থবোধক হয়ে পড়ে। স্বত্বহীন প্রেমাকাঙ্ক্ষা নিরাসক্তির চরম। বৈরাগ্যও সমাজ-সংসার-প্রেম-ভালোবাসার প্রতি নিরাসক্তি থেকেই জাত। এজন্যই কবি যখন বলেন, ছাড় স্বার্থ, মুক্তি পথ দেখ্'[১৫৮] তখন 'প্রেম কহে, তাহলে তো তুমি আমি এক'।[১৫৯] —যেমন এক বিরাম ও কাজ। প্রকৃত প্রস্তাবে কাজ ও বিরাম অভিন্ন-হৃদয়—

বিরাম কাজেরই অঙ্গ এক সাথে গাঁথা,
নয়নের অংশ যেমন নয়নের পাতা।[১৬০]

জীবন ও মৃত্যুর ক্ষেত্রেও অন্য অভিধা প্রযোজ্য নয়। জীবন ও মৃত্যু এক বৃন্তে দু'টি ফুল নয়, এক ফুলের দু'টি পাঁপড়ি।—

জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার অঙ্গ পা-তোলা পা-ফেলা।[১৬১]

অর্থাৎ আরম্ভ আর শেষের মত। আমরা যাকে আরম্ভ বলি, সে তো শেষেরই প্রান্তসীমা। আরম্ভের যেখানে শেষ, শেষের সেখানেই শুরু। শেষ আর আরম্ভ তাই এক অভিন্ন জিনিসের দুই প্রান্ত মাত্র।—

আরম্ভ কহিল, ভাই, যেথা শেষ হয়
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ-উদয়[১৬২]

এ-সব সামান্য কথার অসামান্য চমকের প্রকৃত কারণ দৃষ্টিপাতের ভিন্নতা জনিত বৈশিষ্ট্য। এই খণ্ড ক্ষুদ্র কবিতাগুলো পড়তে পড়তে জানা কথায় অজানা রহস্য আবিষ্কার করে পাঠক চকিত হয়ে ওঠে। কবি-প্রতিভার যাদু স্পর্শে সামান্য হয়ে ওঠে অসামান্য, লাভ করে প্রাবচনিক মাধুর্য।—

মৃত্যু কহে, পুত্র নিব; চোর কহে ধন।
ভাগ্য কহে, সব নিব যা তোর আপন।
নিন্দুক কহিল, লব তব যশোভার।
কবি কহে, কে লইবে আনন্দ অমার?[১৬৩]

এই কবিতায় আনন্দকে কবি অভিহিত করেছেন 'অপহরণীয়'[১৬৪] বলে। সত্যিতো আনন্দের চেয়ে অপহরণীয় আর কি আছে? আর কি থাকতে পারে? কবি অভিহিত এই অপহরণীয় আনন্দই *কণিকা*-র প্রকৃত আনন্দ। অখণ্ড মনোযোগ সহকারে একবার পাঠ করলে 'অপরূপ আনন্দের ভার'-এ পাঠক চিত্ত হিল্লোলিত হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম অনুভবের এক অভাবনীয় ঐন্দ্রজালিক অনুভূতিতে আলোকিত হয়ে ওঠে মনোলোক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আর-একটি কবিতার কথা এখানে উল্লেখ করব। কবিতাটির নাম 'ছলনা'।[১৬৫] মোহিনী নারীর ছলাকলা বিষয়ে কবির আত্মগত অনুভব এতে ধরা পড়েছে। এতে আদিরসের সূক্ষ্মতম স্পর্শ আছে কিন্তু অশ্লীলতার নাম মাত্র নেই। রমণরত নারী-পুরুষের প্রতীকে বিষয়টি পরিবেশিত হয়েছে। পুরুষের কানে কানে কেলিমগ্ন নারী বলে 'তুমি আমি বাঁধা রব নিত্য প্রেম ডোরে'[১৬৬] কিন্তু যেই না বিনিময় হল শেষ 'নিত্য প্রেম ডোর' গেল ছিন্ন হয়ে। কবির বর্ণনায়—

যখন ফুরায়ে গেল সব লেনাদেনা
কহিল, ভেবেছ বুঝি উঠিতে হবেনা?[১৬৭]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষের বিভিন্ন প্রবৃত্তি, ইচ্ছা-এষণা, হিংসা-প্রতিহিংসা, পরশ্রীকাতরতা-পরনিন্দা, পরচর্চা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, শক্তির দম্ভ, ঈর্ষা, প্রতিশোধ-স্পৃহা, আত্ম-অহংকার, অন্ধ-সমালোচনা, অযৌক্তিক গর্ব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত রূপক-প্রতীকধর্মী এই খণ্ড কবিতাগুলো সমগ্র

মানব জাতির এক অমূল্য সম্পদ। লোকচরিত্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এ-গুলোর ভূমিকা অনস্বীকার্য ও তর্কাতীত। এ-গুলোর সাহায্যে মানব-প্রবৃত্তির গহীনতম অন্ধকারের উপর তীব্র আলোক নিক্ষেপ করেছেন কবি। এতে নীতি আছে, প্রীতি আছে, শিক্ষা আছে, আত্মশুদ্ধির ইঙ্গিত আছে। আছে চারিত্র অর্জনের উপায় নির্দেশনা।

এবং এসব কারণেই সমগ্র কাব্য পরিমণ্ডল তো বটেই, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুদ্র কাব্যগুলির মধ্যেও *কণিকা* একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। এর আঙ্গিক ও কলেবরইযে শুধু স্বতন্ত্র, তা নয়, দর্শন ও মননগত দিক থেকেও আকর্ষক। রবীন্দ্রনাথের বিপুল রচনাসম্ভারের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে প্রচুর প্রবচনের সন্ধান মিলবে কিন্তু একটি বিশেষ কাব্যের সব কয়টি কবিতা প্রবচন-মাধুর্যে স্নিগ্ধ, এটা *কণিকা* ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ।

কণিকা-র মোট ১১১ টি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটি বিন্দুতে সিন্ধু ধারণের মহিমায় দীপ্ত। এ-গুলো কাহিনী-প্রধান নয়, মর্ম-প্রধান। বর্ণনামূলক নয়, শিক্ষামূলক। ক্ষুদ্রতম এককে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবচনের মত প্রীতিময় ও স্নিগ্ধ। তৃণ পল্লবে পতিত ভোরের শিশিরের মত টলমলে—প্রাণময়। মুক্তার মত দামী—হীরার মত দ্যুতিময়। কোন কালে এমন দুর্ঘটনা যদি ঘটে, এই খণ্ড কবিতাগুলি ব্যতীত সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য বিলুপ্ত হয়ে যায় পৃথিবীর ইতিহাস থেকে, *কণিকা* তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবে কিংবদন্তীর যুবরাজ হিসেবে। তাঁকে অভিহিত করা যাবে সাহিত্যিক প্রবচনের আধুনিক খনা বলে। তুলনা করা যাবে ডাকের বচনের সাথে তাঁর প্রবচনসমূহকে তূল্যমূল্যে।

তথ্যনির্দেশ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বলাকা,* র.র.২, প্রথম বাংলাদেশ সুলভ সংস্করণ, ঢাকা, ১লা বৈশাখ, ১৩৮০, পৃ.৪৭৭

২ William Shakespear, *Hamlet*, Rama Brothers, Educational Publishers, New Delhi, 2nd edition, 1989, Page 208.

৩ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পালামৌ,* বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, পৌষ ১৩৯৬, ডিসেম্বর ১৯৮৯, পৃ.১৭

৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *কপালকুণ্ডলা, বঙ্কিম রচনাবলী,* প্রথম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, সংশোধিত চতুর্দশ প্রকাশ, মাঘ ১৩৯৭, পৃ.৭৫

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কণিকা,* র.র.১, ঝিনুক পুস্তিকা, বাংলাদেশ প্রথম প্রকাশ, ১লা পৌষ, ১৩৭৯, ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ৫৯৮

৬ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কড়ি ও কোমল,* র. র. ১, প্রথম প্রকাশ, ১লা পৌষ, ১৩৭৯, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২, পৃ.১৪৯

৭ ঐ, *মানসী,* ঐ. ঐ. পৃ. ৩১৫

৮ ঐ, *ক্ষণিকা,* ঐ. ঐ. পৃ. ৭৬৫

৯ ঐ, *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী,* ঐ, ঐ, পৃ. ১৪২

১০ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* দ্বিতীয় খণ্ড, প-২, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লী, তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৮৮, পৃ. ১৩৯০

১১ মুহম্মদ আব্দুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১ম সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৯১, ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫, পৃ.৩৫১

১২ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫১

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৫

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৭

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

১৬ মযহারুল ইসলাম, 'বাংলা প্রবাদে মেটা ফোকলোর', জাতীয় ফোকলোর কনফারেন্স '৯২-স্মরণিকা, পৃ.৬

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

১৮ মুহম্মদ আব্দুল খালেক, প্রাগুক্ত, ১৯৮৫, পৃ. ৩৫১

১৯ প্রাগুক্ত

২০ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রকাব্য পরিক্রমা,* পরিবর্ধিত, পুনর্লিখিত ও পরিমার্জিত পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ২৫শে বৈশাখ, ১৩৯৩, পৃ.৩৮৩-৮৪

২১ প্রাগুক্ত

২২ প্রাগুক্ত

২৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কণিকা,* র. র. ১, প্রথম বাংলাদেশ সুলভ সংস্করণ, ১লা পৌষ, ১৩৭৯, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২, পৃ. ৫৮৫

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৫

২৫ প্রাগুক্ত

২৬ প্রাগুক্ত

২৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯০
২৮ প্রাগুক্ত
২৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০১
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৫
৩১ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৫
৩২ প্রাগুক্ত
৩৩ প্রাগুক্ত
৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৬
৩৫ প্রাগুক্ত
৩৬ প্রাগুক্ত
৩৭ প্রাগুক্ত
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৮
৩৯ প্রাগুক্ত
৪০ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০১
৪১ প্রাগুক্ত
৪২ প্রাগুক্ত
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৩
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৫
৪৫ প্রাগুক্ত
৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৪
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৬
৪৮ প্রাগুক্ত
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৭
৫০ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯১
৫১ প্রাগুক্ত
৫২ প্রাগুক্ত
৫৩ প্রাগুক্ত
৫৪ প্রাগুক্ত
৫৫ প্রাগুক্ত

৫৬ প্রাগুক্ত
৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯১-৯২
৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯২
৫৯ প্রাগুক্ত
৬০ প্রাগুক্ত
৬১ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৩
৬২ প্রাগুক্ত
৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৬
৬৪ প্রাগুক্ত
৬৫ প্রাগুক্ত
৬৬ প্রাগুক্ত
৬৭ প্রাগুক্ত
৬৮ প্রাগুক্ত
৬৯ প্রাগুক্ত
৭০ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৫
৭১ প্রাগুক্ত
৭২ প্রাগুক্ত
৭৩ প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৯৮
৭৪ প্রাগুক্ত
৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৭
৭৬ প্রাগুক্ত
৭৭ প্রাগুক্ত
৭৮ প্রাগুক্ত
৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৮
৮০ প্রাগুক্ত
৮১ প্রাগুক্ত
৮২ প্রাগুক্ত
৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০০
৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৮

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৫
৮৬ প্রাগুক্ত
৮৭ প্রাগুক্ত
৮৮ প্রাগুক্ত
৮৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৮৯
৯০ প্রাগুক্ত
৯১ প্রাগুক্ত
৯২ প্রাগুক্ত
৯৩ প্রাগুক্ত
৯৪ প্রাগুক্ত
৯৫ প্রাগুক্ত
৯৬ প্রাগুক্ত
৯৭ প্রাগুক্ত
৯৮ প্রাগুক্ত
৯৯ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯০
১০০ প্রাগুক্ত
১০১ প্রাগুক্ত
১০২ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯১
১০৩ প্রাগুক্ত
১০৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯২
১০৫ প্রাগুক্ত
১০৬ প্রাগুক্ত
১০৭ প্রাগুক্ত
১০৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৩
১০৯ প্রাগুক্ত
১১০ প্রাগুক্ত
১১১ প্রাগুক্ত
১১২ প্রাগুক্ত
১১৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৪

১১৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৩
১১৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৪
১১৬ প্রাগুক্ত
১১৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৩
১১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৪
১১৯ প্রাগুক্ত
১২০ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৮
১২১ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৪
১২২ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৮
১২৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৬
১২৪ প্রাগুক্ত
১২৫ প্রাগুক্ত
১২৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৭
১২৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৬
১২৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৭
১২৯ প্রাগুক্ত
১৩০ প্রাগুক্ত
১৩১ প্রাগুক্ত
১৩২ প্রাগুক্ত
১৩৩ প্রাগুক্ত
১৩৪ প্রাগুক্ত
১৩৫ প্রাগুক্ত
১৩৬ প্রাগুক্ত
১৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৮
১৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০১
১৩৯ প্রাগুক্ত
১৪০ প্রাগুক্ত
১৪১ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৪
১৪২ প্রাগুক্ত

১৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০২

১৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৬

১৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০২

১৪৬ প্রাগুক্ত

১৪৭ প্রাগুক্ত

১৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৩

১৪৯ প্রাগুক্ত

১৫০ প্রাগুক্ত

১৫১ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৪

১৫২ প্রাগুক্ত

১৫৩ প্রাগুক্ত

১৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৫

১৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০২

১৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ.৫৯৬

১৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০২

১৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৩

১৫৯ প্রাগুক্ত

১৬০ প্রাগুক্ত

১৬১ প্রাগুক্ত

১৬২ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৫

১৬৩ প্রাগুক্ত

১৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৩

১৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ.৬০৪

১৬৬ প্রাগুক্ত

১৬৭ প্রাগুক্ত